بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৫ জুন, ২০২০ মোতাবেক ০৫ এহ্সান, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেনঃ

আমি আজ আবার বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ করব। তাদের মধ্যে থেকে যার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে তার নাম হলো, হযরত সুহায়েব বিন সিনান (রা.)। হযরত সুহায়েব (রা.)-এর পিতার নাম সিনান বিন মালেক আর মাতার নাম ছিল সালমা বিনতে কাঈদ। হযরত সুহায়েব (রা.)-এর স্বদেশ ছিল মোসল। তার পিতা বা চাচা পারস্য সম্রাটের পক্ষ থেকে আবুল্লাহ্'র গভর্ণর ছিলেন। আবুল্লাহ্ হলো দজলার তীরবর্তী একটি শহর যা পরবর্তীতে বসরা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। রোমানরা সেই অঞ্চলের ওপর হামলা করে এবং অল্পবয়স্ক হযরত সুহায়েব (রা.) কে বন্দি করে নিয়ে যায়। আবুল কাসেম মাগরেবীর মতে তার নাম ছিল উমায়রাহ্, (কিন্তু) রোমনরা তার নাম সুহায়েব রাখে। হযরত সুহায়েব (রা.) উজ্জ্বল লালচে বর্ণের ছিলেন। তিনি দীর্ঘকায়ও ছিলেন না আবার খাটোও ছিলেন না এবং মাথার চুল ছিল ঘন। হযরত সুহায়েব (রা.) রোমানদের মাঝে বড় হন। তার কথায় জড়তা ছিল। রোমানদের কাছ থেকে ব্যক্তি ক্বালব নামের অপর এক এক ব্যক্তি তাকে কিনে মক্কা চলে আসে। পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ্ বিন জুদআন তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেয়। আব্দুল্লাহ্ বিন জুদআনের মৃত্যু এবং মহানবীর অভ্যুদয় পর্যন্ত হযরত সুহায়েব (রা.) মক্কাতেই অবস্থান করেন। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত সুহায়েব (রা.)-এর সন্তানরা বলে, হযরত সুহায়েব (রা.) যখন বোঝার বয়সে উপনীত হন তখন রোম থেকে পালিয়ে মক্কায় চলে আসেন আর আব্দুল্লাহ্ বিন জুদআন এর মিত্রতা অবলম্বন করেন এবং তার মৃত্যু পর্যন্ত তার সাথেই থাকেন।

তাঁর সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সুহায়েব একজন কৃতদাস ছিলেন, যিনি রোম থেকে বন্দি অবস্থায় এসেছিলেন। তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন জুদআন এর ক্রীতদাস ছিলেন যে তাঁকে করে মুক্ত করে দিয়েছিল। তিনিও মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনেন এবং তাঁর খাতিরে তিনি বিভিন্ন ধরণের কষ্ট ভোগ করেন। এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) অন্যদের অথবা ক্রীতদাসদের সহায়তায় এই কুরআন রচনা করেছেন মর্মে পবিত্র কুরআনে অবিশ্বাসীদের যে উক্তি রয়েছে, এর একটি উত্তর হলো, এসব ক্রীতদাস তো মুসলমান হওয়ার কারণে বিপদাপদ ও নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়। তবে কি এই ক্রীতদাসরা নিজেদের ওপর এসব বিপদ টেনে আনার জন্যই মহানবী (সা.)-কে সাহায্য করেছিলেন? আর তারা কেবল গোপনেই সাহায্য করে নি বরং প্রকাশ্যেও এসে গেছেন এবং এসব বিপদাপদ ও নিপীড়ন-নির্যাতন অবিচলতার সাথে সহ্যও করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এটি নিতান্তই দুর্বল আপত্তি। এটি তো ছিল মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী সেসব মু'মিনের খোদা তা'লা ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান, যা তাদেরকে অবিচল রেখেছে। তারা মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে ইসলাম শিখেন আর আল্লাহ্ তা'লার ওহীর প্রতি ঈমান আনেন। যাহোক, এ প্রসঙ্গে এই ছিল বিবরণ।

হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) বলেন, হযরত সুহায়েব (রা.)-এর সাথে দ্বারে আরকামের দরজায় আমার সাক্ষাৎ হয় তখন মহানবী (সা.) সেখানে অবস্থান করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করি, তোমার ইচ্ছা কী? হযরত সুহায়েব (রা.) আমাকে বলেন, তোমার ইচ্ছা কী? আমি বলি, মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে আমি তাঁর বাণী শুনতে চাই। হযরত সুহায়েব (রা.) বলেন, আমিও তা–ই চাই। হযরত আম্মার (রা.) বলেন, অতঃপর আমরা দু'জনই মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই। তিনি আমাদের সামনে ইসলামী শিক্ষা তুলে ধরেন যা শুনে আমরা ইসলাম গ্রহণ করি। সারা দিন আমরা সেখানেই অবস্থান করি এবং সন্ধ্যা হলে গোপনে সেখান থেকে বেরিয়ে আসি। হযরত আম্মার (রা.) এবং হযরত সুহায়েব (রা.) ত্রিশের অধিক ব্যক্তির (ইসলাম গ্রহণের) পর ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে চারজন ছিলেন অগ্রগামী। তিনি বলেন, (এক্ষেত্রে) আমি আরবদের মাঝে, সুহায়েব রোমানদের মাঝে, সালমান পারশ্যবাসীদের মাঝে আর বেলাল ছিলেন ইথিওপিয়ানদের মাঝে অগ্রগামী।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন তারা ৭ জন ছিলেন। (প্রথম হলেন) স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা.), তাঁর প্রতি শরীয়ত অবতীর্ণ হয়, আর এরপর হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আম্মার (রা.) ও তার মাতা সুমাইয়া (রা.), হযরত সুহায়েব (রা.), হযরত বেলাল (রা.) এবং হযরত মিক্বদাদ (রা.)। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর চাচা আবু তালিবের মাধ্যমে সুরক্ষিত রাখেন আর হযরত আবু বকর (রা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর জাতির মাধ্যমে নিরাপদ রাখেন। এ সম্পর্কে বিগত (একটি) খুতবায় আমি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি যে, এটি রেওয়ায়েতকারীর ধারণা মাত্র, নতুবা মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কেও সেসব নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছিল। প্রাথমিক অবস্থায় কিছুটা রক্ষা পেলেও পরবর্তীতে (এর) শিকারে পরিণত হতে হয়েছিল। যাহোক রেওয়ায়েতকারী বলেন, মুশরিকরা অন্যদের ধরে নিয়ে লৌহবর্ম পরাত এবং উত্তপ্ত রোদে (ফেলে রেখে) তাদেরকে পোড়াত। অতএব তাদের মাঝে হযরত বিলাল (রা.) ব্যতীত আর কেউই ছিলেন না যারা তাদের সেই মতের সাথে সহমত হননি, কেননা আল্লাহ্র খাতিরে নিজের প্রাণ তার কাছে অর্থহীন হয়ে গিয়েছিল এবং নিজ জাতির কাছেও তিনি মূল্যহীন ছিলেন। তারা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ছেলেপেলেদের হতে তুলে দিত আর তারা তাকে মক্কার বিভিন্ন উপত্যকায় টানাহ্যাঁচড়া করে বেড়াত। তখন বেলাল (রা.) কেবল আহাদ আহাদ বলে আর্তনাদ করতেন। যাহোক যেভাবে আমি বলেছি তারা সকলেই এসব নির্যাতন সহ্য করেছেন, ঈমানের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই অবিচলতা প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু যাহোক হযরত বেলাল (রা.) সম্পর্কে যে রেওয়ায়েত রয়েছে তা হলো, তাকে অনেক বেশি নিপীড়ন ও নির্যাতনের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করা হয়েছে।

এছাড়া বলা হয়ে থাকে যে, হযরত সুহায়েব (রা.) সেসব মু'মিনের একজন ছিলেন যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো আর যাদেরকে মক্কায় আল্লাহ্র পথে কষ্ট দেয়া হতো। তাকেও অনেক বেশি কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে হয়েছে। এক রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)-কে এত বেশি কষ্ট দেয়া হতো যে, তিনি কী করছেন তা তিনি বুঝতে পারতেন না। হযরত সুহায়েব (রা.), হযরত আবু ফায়েদ (রা.), হযরত আমের বিন ফুহায়রা (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীরও একই অবস্থা ছিল। এসব সাহাবী সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে,

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমার প্রভু তাদের প্রতি যারা পরীক্ষায় নিপতিত হওয়ার পর হিজরত করে, অতঃপর জিহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে, নিশ্চয় এরপর (তাদের প্রতি) তোমার প্রভু পরম ক্ষমাশীল এবং বার বার কৃপাকারী। (সূরা নাহল: ১১০)

এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী মদিনায় হিজরতকারীদের মাঝে যারা সবার শেষে আসেন তারা ছিলেন হযরত আলী (রা.) এবং হযরত সুহায়েব বিন সিনান (রা.)। এটি রবিউল আউয়াল মাসের মাঝামাঝি সময়ের ঘটনা। মহানবী (সা.) তখন কুবায় অবস্থানরত ছিলেন, তখনও তিনি মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন নি। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সুহায়েব (রা.) মদিনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হলে মুশরিকদের একটি দল তার পিছু ধাওয়া করে। তখন তিনি নিজ বাহন থেকে নামেন এবং তূণে থাকা সব তির বের করে বলেন, হে কুরাইশের দল! তোমাদের জানা আছে যে, আমি তোমাদের দক্ষ তিরন্দাজদের একজন। আল্লাহ্‌র কসম! আমার কাছে যতগুলো তির আছে সবগুলো তোমাদের প্রতি নিক্ষেপ না করা পর্যন্ত তোমরা আমার কাছে আসতে পারবে না। এছাড়াও নিরস্ত্র না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমাদের ওপর তরবারির আঘাত হানব। এখন তোমাদের যা ইচ্ছে কর, তোমরা যদি আমার ধনসম্পদ চাও তাহলে আমার ধনসম্পদ সম্পর্কে তোমাদের বলে দিচ্ছি যে, সেগুলো কোথায় আছে, তোমরা আমার পথ ছেড়ে দাও। তারা বলল, ঠিক আছে। অতএব হযরত সুহায়েব তাদেরকে (সে সম্পর্কে) জানিয়ে দেন। অতঃপর হযরত সুহায়েব (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে সব খুলে বলেন তখন মহানবী (সা.) বলেন, এই বাণিজ্যে আবু ইয়াহিয়া লাভবান হয়েছে। তোমার বাণিজ্য লাভজনক হয়েছে। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, এ প্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (সূরা বাকারা: ২০৮)

অর্থাৎ, আর কতক মানুষ এমনও আছে যারা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বিক্রি করে দেয় আর আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল। আরেক রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, হযরত সুহায়েব (রা.) মক্কা থেকে হিজরত করে মহানবী (সা.)–এর সকাশে উপস্থিত হন। তখন তিনি কুবায় ছিলেন আর তাঁর সাথে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)ও ছিলেন। আর তখন সবার সামনে তরতাজা খেজুরও ছিল যা হযরত কুলুসম বিন হিদাম (রা.) নিয়ে এসেছিলেন। পথিমধ্যে হযরত সুহায়েব (রা.)-এর চোখ ওঠা রোগ হয়। অর্থাৎ চোখের পীড়া হয়েছিল আর তার প্রচণ্ড ক্ষুধাও ছিল, সফরের কারণে ক্লান্তও ছিলেন। হযরত সুহায়েব (রা.) খেজুর খাওয়ার জন্য সামনে হাত বাড়ালে হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সুহায়েবকে দেখুন, তার চোখ ওঠা রোগ হয়েছে অথচ সে খেজুর খাচ্ছে। মহানবী (সা.) রসিকতা করে বলেন, তুমি খেজুর খাচ্ছ! অথচ তোমার চোখ ওঠা রোগ হয়েছে অর্থাৎ চোখ ফুলে আছে আর পানি ঝরছে। তখন হযরত সুহায়েব (রা.) নিবেদন করেন, আমার চোখের যে অংশটুকু ভালো আছে আমি সে অংশ দিয়ে খাচ্ছি। একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা.) মুচকি হাসেন। অতঃপর হযরত সুহায়েব (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, হিজরতের সময় আপনি আমাকে সাথে নিয়ে যাবেন কিন্তু আপনি আমাকে রেখে চলে এসেছেন। এরপর তিনি (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমাকে সাথে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আর আপনিও আমাকে রেখে চলে এলেন? কুরাইশরা আমাকে ধরে আটক করে রাখে। আমি

আমার ধন-সম্পদের বিনিময়ে নিজেকে ও পরিবারকে ক্রয় করেছি। মহানবী (সা.) বলেন, তোমার বাণিজ্য লাভজনক হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন যে,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (সূরা বাকারা: ২০৮)

অর্থাৎ আর কতক মানুষ এমনও আছে যারা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বিক্রি করে দেয় আর আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল। হযরত সুহায়েব (রা.) নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি এক মুদ্ অর্থাৎ আধা কেজি আটা পাথেয় হিসেবে সাথে নিয়েছিলাম। আমি আবোয়াহ্ নামক স্থানে সেই আটা খামির করেছিলাম (আর্থাৎ রুটি বানিয়ে খাই) আর এরপর আপনার সকাশে এসে উপস্থিত হয়েছি। অর্থাৎ এ সফরে কেবল এতটুকুই তার আহার ছিল।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তার সম্পর্কে বলেন, হযরত সুহায়েব (রা.) একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ব্যবসাবাণিজ্য করতেন এবং মক্কার স্বচ্ছল ব্যক্তিদের মাঝে গণ্য হতেন, কিন্তু বিত্তবান হওয়া সত্ত্বেও আর দাসত্ব থেকে স্বাধীন হওয়ার পরও কুরাইশরা তাকে প্রহার করে অচেতন করে ফেলত। মহানবী (সা.) মদিনায় হিজরত করলে সুহায়েব (রা.)ও মদিনায় হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু মক্কার লোকেরা তাকে বাধা দেয় এবং বলে, তুমি মক্কায় যে সম্পদ বানিয়েছ তা মক্কার বাইরে কীভাবে নিয়ে যেতে পার! আমরা তোমাকে মক্কা থেকে যেতে দিব না। সুহায়েব (রা.) বলেন, আমি যদি এসব সম্পদ ছেড়ে যাই তাহলে কি তোমরা আমাকে যেতে দিবে? তারা এ কথায় সম্মত হয় আর তিনি (রা.) তার সমস্ত সম্পত্তি মক্কাবাসীর হাতে তুলে দিয়ে শূন্য হাতে মদিনা চলে যান এবং মহানবী (সা.)-এর চরণে গিয়ে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) বলেন, হে সুহায়েব! তোমার এই ব্যবসা পূর্বের সমস্ত ব্যবসার তুলনায় অধিক লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ পূর্বে পণ্যের বিনিময়ে তুমি অর্থ গ্রহণ করতে কিন্তু এখন অর্থের বিনিময়ে তুমি ঈমান লাভ করেছ। সুহায়েব (রা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে গেলে মহানবী (সা.) তার ও হযরত হারেস বিন সিম্মার (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্বন্ধন স্থাপন করে দেন। হযরত সুহায়েব (রা.) বদর, উহুদ ও পরিখাসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন।

হযরত আয়েয বিন আমর (রা.) রেওয়ায়েত করেন যে, একদা হযরত সালমান (রা.), হযরত সুহায়েব (রা.) এবং হযরত বিলাল (রা.) লোকজনের মাঝে বসা ছিলেন, তখন আবু সুফিয়ান বিন হারব্ তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। লোকেরা বলল, মহান আল্লাহ্‌র তরবারি এখনও আল্লাহ্‌র শত্রুদের মুণ্ডচ্ছেদ করে নি। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তোমরা কি কুরাইশদের নেতৃস্থায়ীয় ব্যক্তি ও নেতা সম্পর্কে এমন কথা বলছ? এ কথা মহানবী (সা.)-কে অবহিত করা হলে তিনি (সা.) বলেন, হে আবু বকর! সম্ভবত তুমি তাদেরকে রাগান্বিত করেছ। যদি তুমি তাদেরকে রাগান্বিত করে থাকো, তাহলে তুমি তোমার মহান প্রভুকে ক্রোধান্বিত করেছ। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) সেই লোকদের কাছে ফিরে যান এবং বলেন, হে আমার ভাইয়েরা! সম্ভবত তোমরা (আমার কথায়) অসন্তুষ্ট হয়েছ। তারা উত্তর দেয় যে, হে আবু বকর! না, (আমরা অসন্তুষ্ট হই নি) আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন।

হযরত সুহায়েব (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যে যুদ্ধাভিযানেই অংশগ্রহণ করেছেন, আমি তাতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি (সা.) যখনই বয়আত নিয়েছেন, আমি তাতে অংশ নিয়েছি। তিনি (সা.) যে সেনাঅভিযানই প্রেরণ করেছেন, আমি তার অন্তর্ভুক্ত ছিলাম

আর তিনি (সা.) যে যুদ্ধের উদ্দেশ্যেই যাত্রা করেছেন, আমিও তাঁর (সা.) সাথে সহযোদ্ধা ছিলাম। আমি মহানবী (সা.)-এর ডানে অথবা বামে থাকতাম। মানুষ যখন সম্মুখ থেকে বিপদের আশঙ্কা করতো, আমি তখন তাদের সম্মুখে থাকতাম। আর মানুষ যখন পিছন থেকে বিপদের আশঙ্কা করতো, আমি তখন তাদের পিছনে থাকতাম। আমি মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুকাল পর্যন্ত কখনো তাঁকে (সা.) শত্রুদের এবং আমার মাঝখানে আসতে দেই নি। হযরত সুহায়েব (রা.) বৃদ্ধকালে লোকজনকে একত্রিত করে খুবই উৎফুল্লচিত্তে নিজের যুদ্ধসংক্রান্ত চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলী শুনাতেন। হযরত সুহায়েব (রা.)-এর ভাষায় অনারবসূলভ বৈশিষ্ট্য ছিল অর্থাৎ আরবদের ন্যায় বাকপটুতা ছিল না।

যায়েদ বিন আসলাম তাঁর পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত উমরের সাথে বের হই। এক পর্যায়ে তিনি 'আলিয়া' নামক স্থানে (অবস্থিত) হযরত সুহায়েবের একটি বাগানে প্রবেশ করেন। হযরত সুহায়েব যখন হযরত উমরকে দেখেন তখন তিনি বলেন, ইয়ান্নাস, ইয়ান্নাস। হযরত উমরের এমন মনে হলো যেন তিনি আন্নাস বলছেন। তখন হযরত উমর বলেন, তার কী হয়েছে, তিনি মানুষকে কেন ডাকছেন? বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, তিনি নিজের দাসকে ডাকছেন, যার নাম ইয়োহান্নাস। মুখের জড়তার কারণে তিনি তাকে এভাবে ডাকছেন। (এরপর সেখানে আরো কথা হয়,) হযরত উমর বলেন, হে সুহায়েব! তিনটি বিষয় ছাড়া আমি তোমার মাঝে আর কোন ত্রুটি দেখি না। তোমার মাঝে যদি সেগুলো না থাকত তাহলে আর কাউকেই আমি তোমার ওপর প্রাধান্য দিতাম না। আমি দেখি যে, তুমি আরব হিসেবে নিজের পরিচয় দাও অথচ তোমার ভাষা আরবী নয়। তুমি তোমার উপনাম আবু ইয়াহিয়া বলে থাক, যা একজন নবীর নাম। এছাড়া তুমি তোমার সম্পদের অপব্যয় কর। হযরত সুহায়েব (রা.) উত্তরে বলেন, সম্পদের অপব্যয় সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো- আমি তা সেখানেই ব্যয় করি যেখানে ব্যয় করা আবশ্যক, আমি অপব্যয় করি না। আমার ডাকনামের যতটুকু সম্পর্ক, সে বিষয়ে আমার বক্তব্য হলো- মহানবী (সা.) আমার ডাকনাম আবু ইয়াহিয়া রেখেছিলেন। আমি এটি কখনো পরিত্যাগ করব না। এছাড়া আরবদের প্রতি আরোপিত হওয়া সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো- অল্প বয়সেই রোমানরা আমাকে বন্দি করে নিয়ে গিয়েছিল, তাই আমি তাদের ভাষা শিখেছি, (কিন্তু বাস্তবে) আমি নামের বিন কাসেদ গোত্রের সদস্য।

হযরত উমর (রা.) হযরত সুহায়েব (রা.)-কে খুব ভালোবাসতেন এবং তার সম্পর্কে খুবই ভালো ধারণা রাখতেন। এমনকি হযরত উমর (রা.) যখন আহত হন তখন তিনি ওসীয়্যত করেন যে, আমার জানাযার নামায সুহায়েব পড়াবেন এবং তিন দিন পর্যন্ত তিনি মুসলমানদের নামাযের ইমাম হবেন যতক্ষণ না শূরা পরবর্তী খলীফা সম্পর্কে একমত হয়।

৩৮ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে হযরত সুহায়েব (রা.) মৃত্যু বরণ করেন। কারো করো মতে তার মৃত্যু হয়েছে ৩৯ হিজরী সনে। মৃত্যুকালে হযরত সুহায়েবের বয়স ছিল ৭৩ বছর, আবার কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে তার বয়স ৭০ বছর ছিল। তিনি মদিনাতে সমাহিত হয়েছেন।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন, হযরত সা'দ বিন রবি (রা.)। হযরত সা'দ বিন রবি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু হারেস বংশের সদস্য ছিলেন। তার পিতার নাম রবি বিন আমর এবং মাতার নাম ছিল হুযায়লা বিনতে এনাবা। হযরত সা'দ (রা.)-এর দুজন স্ত্রী ছিলেন। একজনের নাম ছিল আমরা বিনতে আযম এবং অপরজনের

নাম ছিল হাবীবা বিনতে যায়েদ। হযরত সা'দ বিন রবি (রা.)-র দুই মেয়ে ছিল। এক জনের নাম ছিল উম্মে সা'দ, একস্থানে তাকে উম্মে সাঈদও লেখা হয়েছে, তার আসল নাম ছিল জামিলা। হযরত সা'দ বিন রবি (রা.) অজ্ঞতার যুগেও লেখাপড়া জানতেন, যখন খুব কম লোকেরই পড়াশোনা জানা ছিল। হযরত সা'দ বনু হারেস গোত্রের নকীব বা সর্দার ছিলেন। তার সাথে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রা.)ও একই গোত্রের নেতা ছিলেন। হযরত সা'দ (রা.) আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় বায়আতের সময় উপস্থিত ছিলেন। মদিনায় হিজরতের সময় মহানবী (সা.) হযরত সা'দ (রা.) এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েত হলো, হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) বর্ণনা করেন, আমাদের মদিনায় আসার পর রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে এবং হযরত সা'দ বিন রবি (রা.)-কে পরস্পর ভাই-ভাই বানিয়ে দেন। তখন সা'দ বিন রবি (রা.) বলেন, আমি আনসারদের মাঝে অধিক সম্পদশালী, কাজেই আমি (আমার সম্পদ) ভাগ করে অর্ধেকটা আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি, আর আমার দুইজন স্ত্রীর মধ্যে থেকে যাকে আপনার পছন্দ তাকে আমি আপনার জন্য ছেড়ে দিব। তার ইদ্দত পূর্ণ হবার পর আপনি তাকে বিয়ে করুন। একথা শুনে হযরত আব্দুর রহমান (রা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে বলেন, আমার এসবের কোন প্রয়োজন নেই। আপনি শুধু বলুন, এখানে কোন বাজার আছে কি যেখানে ব্যবসাবাণিজ্য হয়। হযরত সা'দ (রা.) বলেন, কায়নুকার বাজার রয়েছে। এটি জানার পর হযরত আব্দুর রহমান (রা.) প্রভাত সেখানে যান এবং সেখান থেকে পনির ও ঘি নিয়ে আসেন। এভাবে তিনি প্রতিদিন সকালে সেই বাজারে যেতে থাকেন। কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত আব্দুর রহমান (রা.) আসেন এবং তার গায়ে জাফরানের চিহ্ন ছিল। তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। তার বিয়ে হয়ে গেছে কিনা– এটি মহানবী (সা.) এর জানা ছিল না। (সে যুগে) বিয়ে হয়ে যাওয়ার চিহ্ন হতো গায়ে জাফরান লাগানো। যাহোক মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি বিয়ে করেছ? তিনি বলেন, জ্বী, হ্যাঁ। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কাকে? উত্তরে তিনি বলেন, আনসারদের একজন নারীকে। তিনি (সা.) জানতে চান, মোহরানা কত দিয়েছ? তিনি বলেন, একটি খেজুর-আঁটির সমান স্বর্ণ বা স্বর্ণের একটি আঁটি। মহানবী (সা.) বলেন, একটি ছাগল জবাই করে হলেও ওয়ালিমা কর; অর্থাৎ তার (আর্থিক) সামর্থ্য অনুসারে ওয়ালিমার দাওয়াতের আয়োজন করার প্রতি তার মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

হযরত সা'দ বিন রবী বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। উহুদের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) বলেন, কে আমাকে সা'দ বিন রবী-র সংবাদ এনে দিবে? এক ব্যক্তি বলেন, আমি। অতএব তিনি গিয়ে নিহতদের মাঝে তাকে খুঁজতে আরম্ভ করেন। হযরত সা'দ সেই ব্যক্তিকে দেখে বলেন, তুমি কেমন আছ? সেই ব্যক্তি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর (সা.) কাছে আপনার সংবাদ নিয়ে যাওয়ার জন্য। হযরত সা'দ বলেন, মহানবী (সা.)-এর সমীপে আমার সালাম পৌঁছাবে এবং তাঁকে (সা.) একথা জানিও যে, আমার শরীরে বর্শার বারোটি আঘাত লেগেছে, আর আমার প্রতিপক্ষ যোদ্ধারা দোযখে পৌঁছে গিয়েছে, (অর্থাৎ যে-ই আমার সাথে লড়াই করেছে, তাকে আমি হত্যা করেছি)। আর আমার জাতিকে বলো, যদি রসূলুল্লাহ্ (সা.) শহীদ হয়ে যান আর তোমাদের মাঝে কোন এক ব্যক্তিও জীবিত থাকে তাহলে আল্লাহ্‌র দরবারে তোমাদের কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না। কথিত আছে, যে ব্যক্তি তার কাছে গিয়েছিলেন তিনি ছিলেন

হযরত উবাই বিন কা’ব। হযরত সা’দ হযরত উবাই বিন কা’বকে বলেন, তোমার জাতিকে বলো, সা’দ বিন রবী তোমাদেরকে এই বার্তা দিয়েছেন যে– আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আকাবার রাতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে যে অঙ্গীকার তোমরা করেছিলে তা স্মরণ রেখো– এটি ভিন্ন একটি রেওয়ায়েত। আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ্‌র দরবারে তোমাদের কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না যদি কাফেররা তোমাদের নবী (সা.) পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর তোমাদের মধ্যে কোন একজনেরও চোখ নাড়ানোর সামর্থ্য থাকে। অর্থাৎ কোন এক ব্যক্তিও যদি জীবিত থাকে, তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না। হযরত উবাই বিন কা’ব বর্ণনা করেন, আমি তখনও সেখানেই ছিলাম, (অর্থাৎ হযরত সা’দের পাশেই ছিলেন), এমতাবস্থায় হযরত সা’দ বিন রবী ইহধাম ত্যাগ করেন; তিনি তখন আঘাতে-আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ছিলেন। আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে ফিরে আসি এবং তাঁকে (সা.) সবকিছু অবহিত করি যে, এই-এই আলাপ হয়েছিল, তার অবস্থা এরূপ ছিল এবং এভাবে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, ‘আল্লাহ্ তা’লা তার প্রতি কৃপা করুন, তিনি জীবত অবস্থায়ও এবং মৃত্যুর পরও আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের (সা.) হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। হযরত সা’দ বিন রবী ও হযরত খারেজা বিন যায়েদকে একই কবরে সমাহিত করা হয়।

হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব হযরত সা’দের শাহাদাতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন যে,

মহানবী (সা.) রণক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, আর শহীদদের লাশের খোঁজ-খবর নেয়া হচ্ছিল। মুসলমানদের সম্মুখে তখন যে দৃশ্য ছিল তা রক্তাশ্রু ঝরানোর মতো ছিল। অর্থাৎ যখন যুদ্ধ শেষ হয় তখন মহানবী (সা.) আহত হওয়া সত্ত্বেও রণক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হন আর শহীদদের লাশের খোঁজ-খবর নেয়া শুরু হয় যে, তাদের কীভাবে সমাহিত করা হবে, এছাড়া আহতদের সেবা-শুশ্রূষার কাজ আরম্ভ হয়। যাহোক তখন যে দৃশ্য মুসলমানদের সামনে ছিল তা এতটা ভয়ংকর ছিল যে, তিনি বলেন, তা রক্তাশ্রু ঝরানোর মতো ছিল। সত্তরজন মুসলমান রক্ত ও ধূলোমলিন দেহে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়েছিলেন এবং আরবের বর্বর অঙ্গচ্ছেদ প্রথার ভয়াল দৃশ্য তুলে ধরছিলেন। অর্থাৎ তারা কেবল শহীদ-ই হন নি, বরং তাদের অঙ্গচ্ছেদও করা হয়েছিল; তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন করা হয়েছিল, তাদের চেহারা বিকৃত করা হয়েছিল। তিনি লিখেন যে, এই নিহতদের মধ্যে কেবল ছয়জন ছিলেন মুহাজির, বাকি সবাই ছিলেন আনসার; আর কুরাইশের নিহতদের সংখ্যা ছিল তেইশ। মহানবী (সা.) যখন তাঁর চাচা ও দুধভাই হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিবের লাশের কাছে পৌঁছেন তখন তাঁর নিয়ন্ত্রণ হারানোর উপক্রম হয়, কেননা আবু সুফিয়ানের নির্দয় স্ত্রী হিন্‌দ তার লাশকে নির্মমভাবে বিকৃত করেছিল। তিনি (সা.) কিছুক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং তাঁর পবিত্র চেহারায় দুঃখ ও ক্ষোভের ছাপ স্পষ্ট ছিল। এক মূহুর্তের জন্য তিনি এটিও ভাবেন যে, মক্কার এই বন্য পশুদের সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদেরই মতো আচরণ না করা হবে, তারা সম্ভবত সম্বিৎ ফিরে পাবে না এবং তাদের শিক্ষা হবে না, কিন্তু তিনি (সা.) এ চিন্তা থেকে বিরত হন এবং ধৈর্যধারণ করেন, বরং এরপর মহানবী (সা.) অঙ্গ বিকৃত করার যে প্রথা ছিল অর্থাৎ চেহারা বিকৃত করা কিংবা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটার পূর্বরীতি ইসলাম ধর্মে চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলেন, শত্রুরা যা-ই করুক না কেন তোমরা এ ধরনের পাশবিক আচরণ থেকে সর্বাবস্থায় বিরত থাকবে এবং পুণ্য ও অনুগ্রহের রীতি অবলম্বন করবে। মহানবী (সা.)-এর ফুপু সাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব তার ভাই হামযাকে

গভীরভাবে ভালোবাসতেন। তিনিও মুসলমানদের পরাজয়ের সংবাদ শুনে মদিনা থেকে বেরিয়ে আসেন। তার ছেলে যুবায়ের ইবনুল আওয়াম-কে মহানবী (সা.) বলেন, তুমি তোমার মাকে মামার লাশ দেখাবে না, কিন্তু বোনের ভালোবাসা কি আর বাধন মানে? ছেলে যদিও বলেছিল যে, হযরত হামযার লাশ দেখবেন না, কেননা তার অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছে, চেহারা বিকৃত করা হয়েছে, তারপরও তিনি পীড়াপীড়ি করে বলেন, আমাকে হামযার লাশ দেখাও। আমি কথা দিচ্ছি, ধৈর্যধারণ করবো এবং হাহুতাশমূলক কোন কথা উচ্চারণ করব না। অতএব তিনি সেখানে যান এবং ভাইয়ের লাশ দেখে إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ পড়ে চুপ হয়ে যান। এরপর তিনি [অর্থাৎ হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)] লিখেন,

কুরাইশরা অন্যান্য সাহাবীর লাশের সাথেও একই ব্যবহার করে। মহানবী (সা.)-এর ফুপাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ-এর লাশকেও ঘৃণ্যভাবে বিকৃত করা হয়েছিল। মহানবী (সা.) এক লাশের পর অন্য লাশের কাছে যান আর তাঁর চেহারায় দুঃখ ও কষ্টের ছাপ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে থাকে। খুব সম্ভব তখনই মহানবী (সা.) বলেন, কেউ গিয়ে দেখ যে, আনসারদের গোত্রপ্রধান সা'দ বিন রবী'র কী অবস্থা, তিনি জীবিত আছেন নাকি শহীদ হয়ে গিয়েছেন, কেননা যুদ্ধের সময় আমি তাকে শত্রুদের বর্ষায় মারাত্মকভাবে পরিবেষ্টিত দেখেছি। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে একজন আনসারী সাহাবী উবাই বিন কা'ব যান এবং যুদ্ধক্ষেত্রে এদিক সেদিক সা'দকে অনুসন্ধান করেন, কিন্তু কোন খোঁজ পান নি। পরিশেষে তিনি উচ্চস্বরে ডাকতে থাকেন এবং সা'দের নাম ধরে ডাকেন, কিন্তু তারপরও তার কোন খোঁজ পান নি। নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে উদ্যত হলে হঠাৎ তার মনে হলো যে, আমি মহানবী (সা.)-এর নাম নিয়ে ডেকে দেখি, এতে করে হয়ত জানা যাবে। অর্থাৎ প্রথমে শুধু নাম ধরে ডাকেন এরপর ভাবেন, মহানবী (সা.)-এর কথা বলে ডেকে দেখি যে, তিনি (সা.) তোমাকে খোঁজার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং তিনি উচ্চস্বরে ডেকে বলেন, সা'দ বিন রবী কোথায় আছেন? মহানবী (সা.) আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। এই ধ্বনি সা'দের মৃত্যুপথযাত্রী দেহে এক বিদ্যুৎ প্রবাহ বইয়ে দেয়। লাশের স্তুপের মধ্যে তিনি আধমরা পড়েছিলেন। মহানবী (সা.)-এর নাম শুনে তার শরীরে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টি হয় এবং তিনি হতচকিত অথচ অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে সাড়া দিয়ে বলেন, কে তুমি? আমি এখানে। উবাই বিন কা'ব ভালোভাবে তাকান আর কিছুটা দূরে লাশের একটি স্তুপে সা'দকে খুঁজে পান যিনি তখন অন্তিম নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন। উবাই বিন কা'ব তাকে বলেন, আমাকে মহানবী (সা.) পাঠিয়েছেন তোমার খবরাখবর জেনে তাঁকে (সা.) অবগত করার জন্য। সা'দ উত্তরে বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আমার সালাম দিয়ে বলবেন, খোদার রসূলগণ তাদের অনুসারীদের ত্যাগ ও নিষ্ঠার কারণে যে প্রতিদান লাভ করেন আল্লাহ্ তা'লা সেই প্রতিদান আপনাকে সকল নবীর চেয়ে অধিক প্রদান করুন এবং আপনার অন্তর প্রশান্ত করুন। অপরদিকে আমার মুসলমান ভাইদেরকেও আমার সালাম পৌঁছাবেন এবং আমার জাতিকে বলবেন, তোমাদের জীবন থাকতে যদি মহানবী (সা.) এর কোন ক্ষতি হয় তবে আল্লাহ্র সামনে তোমাদের কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না। এ কথা বলে সা'দ ইহলোক ত্যাগ করেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও এ ঘটনা নিজের ভাষায় বর্ণনা করে বলেন, উহুদের যুদ্ধের একটি ঘটনা রয়েছে। যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) হযরত উবাই বিন কা'বকে বলেন, যাও! আহতদের খবরাখবর নাও। খবরাখবর নেয়ার এক পর্যায়ে তিনি হযরত সা'দ বিন রবী-র কাছে পৌঁছেন। তিনি গুরুতর আহত অবস্থায় জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ছিলেন। তিনি

তাকে বলেন, তোমার স্বজাতি ও আত্মীয়-স্বজনকে কোন বার্তা পৌঁছানোর থাকলে আমাকে বল। হযরত সা'দ মুচকি হেসে বলেন, কোন মুসলমানের এদিকে আসার অপেক্ষায়ই আমি ছিলাম যেন বার্তা দিতে পারি। তুমি আমার হাতে হাত রেখে অঙ্গীকার কর যে, আমার এ বার্তা অবশ্যই পৌঁছাবে। এরপর তিনি তাকে যে বার্তা দেন তা হলো, আমার মুসলমান ভাইদেরকে আমার সালাম পৌঁছাবে এবং আমার জাতি ও আত্মীয়-স্বজনকে বলবে মহানবী (স.) আমাদের কাছে আল্লাহ্ তা'লার সর্বোত্তম এক আমানত। আমরা জীবন বাজি রেখে এ আমানতের সুরক্ষা করেছি। এখন আমরা এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি আর এ আমানতের সুরক্ষার দায়িত্ব তোমাদের ওপর ন্যস্ত করছি। তাঁর সুরক্ষার দায়িত্বে তোমরা যেন কোন ত্রুটি করো না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, দেখুন! মানুষ যখন বুঝতে পারে যে, আমি এখন মারা যাচ্ছি তখন তার মাথায় বিভিন্ন ধরনের চিন্তা আসে। সে ভাবে, আমার স্ত্রীর কী হবে? আমার সন্তানদের খোঁজ খবর কে নিবে? কিন্তু এই সাহাবী এরূপ কোন কথা বলেন নি। শুধু এতটুকু বলেছেন যে, আমরা মহানবী (স.)-এর সুরক্ষা করতে করতে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি, তোমরাও এ পথে আমাদের পেছনে আস। সবচেয়ে বড় কাজ হলো, মহানবী (স.) এর সুরক্ষা করা। তিনি লিখেন, এ ঈমানী শক্তিই তাদের মাঝে ছিল, যদ্বারা তারা পুরো পৃথিবীকে উলটপালট করে দিয়েছেন। রোমান ও পারস্য সম্রাটের সিংহাসন তারা ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন। রোমের বাদশাহ্ (কায়সার) বিস্মিত ছিল যে, এরা কারা? কিসরা (বা ইরানের বাদশাহ্) তার সেনাপতিকে লিখেছে, তোমরা যদি এ আরবদেরকেও পরাজিত করতে না পার তবে ফেরত চলে আস আর ঘরে (নারীদের ন্যায়) চুড়ি পরে বসে থাক। সে তার সেনাপতিকে বলে যে, এরা গুইসাপ খাওয়া মানুষ তুমি এদেরকেও প্রতিহত করতে পার না! অর্থাৎ একেবারে সাধারণ মানুষ, খাবারও তাদের জোটে না, গুইসাপ খেয়ে থাকে। সেনাপতি উত্তরে বলে, এদের মাঝে এমন উৎসাহ-উদ্দীপনা বিদ্যমান যে, এদেরকে মানুষ বলে মনে হয় না, এরা ভিন্ন কোন সৃষ্টি বা সাক্ষাৎ কোন আপদ, এরা তরবারি ও বর্শার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, আমরা কীভাবে এদেরকে পরাস্ত করতে পারি?

একবার হযরত সা'দ বিন রবী-র মেয়ে উম্মে সা'দ হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট আসেন। তখন তিনি (রা.) তার জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দেন। হযরত উমর (রা.) এসে জিজ্ঞেস করেন ইনি কে? হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরে বলেন, ইনি সেই ব্যক্তির কন্যা যিনি আমার এবং তোমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, হে রসূলের খলীফা! সেই ব্যক্তি কে? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, সেই ব্যক্তি হলেন তিনি যার মৃত্যু রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবদ্দশায় হয়েছিল। তিনি জান্নাতে নিজের ঠিকানা নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন অথচ আমি ও তুমি এখনও এর অপেক্ষায় আছি।

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত সা'দ বিন রবী-র স্ত্রী তার দুই কন্যাসহ মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এদের উভয়েই হযরত সা'দ বিন রবী-র কন্যা যিনি আপনার সাথে সহযোদ্ধা হিসাবে উহুদের দিন রণক্ষেত্রে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেছেন। তাদের চাচা তাদের উভয়ের সম্পদ নিয়ে নিয়েছে, তারা কিছুই পায়নি। তাদের জন্য কোন সম্পদ অবশিষ্ট রাখে নি; আর যতক্ষণ সম্পদ তাদের হাতে না আসবে তাদের বিয়ে হওয়া সম্ভবপর নয়। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। এরপর উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের উভয়ের চাচাকে ডেকে বলেন, সা'দের

কন্যাদেরকে সা'দের সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ হস্তান্তর কর, তাদের মাকে এক অষ্টমাংশ দাও, আর যা অবশিষ্ট থাকবে তা তোমার। এ ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সিরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে কিছুটা বিশদ আলোচনা করে লিখেন যে,

হযরত সা'দ একজন সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। নিজ গোত্রে স্বতন্ত্র মর্যাদা রাখতেন। তার কোন পুত্র সন্তান ছিল না, শুধুমাত্র দুই মেয়ে এবং স্ত্রী ছিল। যেহেতু তখনও মহানবী (সা.)-এর প্রতি উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোন নতুন শিক্ষা অবতীর্ণ হয় নি আর সাহাবীদের মাঝে আরবের প্রাচীন রীতি অনুসারে উত্তরাধিকার বণ্টন হতো, মৃত ব্যক্তির কোন পুত্র সন্তান না থাকলে তার পৈত্রিক সূত্রের আত্মীয়রা তার সম্পত্তি করতলগত করত এবং বিধবা স্ত্রী ও মেয়েরা রিক্তহস্ত রয়ে যেত, এজন্য সা'দ বিন রবী-র ভাই তার শাহাদাতের পর তার সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করে নেয় এবং তার বিধবা স্ত্রী ও মেয়েরা একেবারে রিক্তহস্ত থেকে যায়। এ কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে সা'দের বিধবা স্ত্রী নিজ দুই কন্যা সন্তানকে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে পুরো বৃত্তান্ত তুলে ধরে নিজের মর্মযাতনার কথা উল্লেখ করেন। এই করুণ কাহিনী মহানবী (সা.)-এর পবিত্র প্রকৃতিকে বেদনাবিহ্বল করে তুলে; কিন্তু যেহেতু তখনও এ ব্যাপারে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি কোন শিক্ষা অবতীর্ণ হয় নি; তাই তিনি বলেন, তুমি অপেক্ষা কর। খোদার পক্ষ থেকে যে শিক্ষা অবতীর্ণ হবে সে অনুসারে সিদ্ধান্ত হবে। মহানবী (সা.) এ বিষয়ে (আল্লাহ্ তা'লার) প্রতি মনোনিবেশ করেন আর স্বল্পকাল অতিবাহিত হতে না হতেই তাঁর (সা.) প্রতি উত্তরাধিকার সম্পর্কিত সেসব আয়াত অবতীর্ণ হয় যা কুরআন শরীফের সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। তখন মহানবী (সা.) হযরত সা'দের ভাইকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, সা'দের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে দুই তৃতীয়াংশ তার মেয়েদেরকে এবং এক অষ্টমাংশ তোমার ভাবির হাতে তুলে দাও আর অবশিষ্টাংশ তুমি নিয়ে নাও। তখন থেকে উত্তরাধিকার বণ্টন সংক্রান্ত সর্বশেষ বিধান প্রবর্তিত হয়। সে অনুসারে মৃত স্বামীর সন্তান থাকলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশের উত্তরাধিকারী হবে তার স্ত্রী আর স্বামী যদি নিঃসন্তান হয় তবে স্ত্রী তার স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে এক-চতুর্থাংশ পাবে। মেয়েরা পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারসূত্রে ভাইয়ের অর্ধেক পাবে। তবে যদি ভাই না থাকে তাহলে অবস্থাভেদে পুরো রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ বা সম্পত্তির অর্ধেকের উত্তরাধিকারী হবে। মা তার পুত্রের এক-ষষ্ঠাংশের উত্তরাধিকারী হবেন, যদি পুত্রের সন্তান থাকে। আর যদি সন্তান না থাকে তাহলে মা এক-তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারী হবেন। একইভাবে অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের অংশ নির্ধারিত হয় এবং নারীর সেই স্বাভাবিক অধিকার, যা পূর্বে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল, তা এভাবে সে পুনরায় ফিরে পায়।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব একটি নোট লিখেছেন। তিনি লিখেন, এ প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, মহানবী (সা.)-এর শিক্ষার একটি স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য হলো- তিনি নারী জাতির সকল বৈধ ও আবশ্যিক অধিকার পরিপূর্ণরূপে সুরক্ষা করেছেন। বরং সত্যকথা হলো, মানব ইতিহাসে মহানবী (সা.)-এর পূর্বে বা পরে এমন কোন ব্যক্তি অতিবাহিত হয়নি যে এভাবে নারী জাতির অধিকার সুরক্ষা করেছে। যেমন উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে, বিয়েশাদীর ক্ষেত্রে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে, তালাক এবং খোলার ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানানো ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে, শিক্ষাদীক্ষার অধিকারের ক্ষেত্রে, সন্তানের ওলী হওয়া ও শিক্ষার ক্ষেত্রে, জাতিগত ও দেশসংক্রান্ত বিষয়ে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে, ব্যক্তি

স্বাধীনতার বিষয়ে, ধর্মীয় অধিকার এবং দায়িত্বাবলীর ক্ষেত্রে, বস্তুত জাগতিক এবং ধর্মীয় সকল ক্ষেত্রে, যেখানেই নারী জাতি ভূমিকা রাখতে পারে মহানবী (সা.) তার সমস্ত প্রাপ্য বৈধ অধিকার প্রদানের স্বীকৃতি দিয়েছেন। নারীর অধিকার রক্ষা করাকে তাঁর উম্মতের জন্য একটি পবিত্র আমানত এবং আবশ্যকীয় দায়িত্ব আখ্যায়িত করেছেন। এ কারণেই, আরবের নারীরা মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবকে নিজেদের মুক্তির সনদ মনে করত। অতঃপর তিনি আরো লিখেন-

আমি উক্ত বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করলে মূল বিষয় থেকে বিচ্যুত হতে হয়, অর্থাৎ নারীর অধিকারের বিষয়টি আলোচ্য নয়, তাই বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই নতুবা আমি উল্লেখ করতাম যে, নারী জাতি সম্পর্কে তাঁর (সা.) শিক্ষা সত্যিকার অর্থে সেই মহান মার্গে উপনীত যে পর্যায়ে পৃথিবীর কোন ধর্ম এবং কোন সমাজব্যবস্থা পৌঁছেনি। আর নিশ্চয় তাঁর নিম্নোক্ত প্রিয় উক্তিটি এক গভীর সত্যের পরিচায়ক যে;

حبِب اِلی مِن دنیا کم النِساء والطِیب وجعِلت قرة عینِی فِی الصلوِة.

(হুব্বেবা ইলাইয়্যা মিন দুনিয়াকুম আন্-নিসাউ ওয়া আত্-তিবু
ওয়া জুয়েলাত কুররাতু আইনী ফিস্ সালাতে)

অর্থাৎ জাগতিক বিভিন্ন জিনিসের মধ্য থেকে আমার প্রকৃতিতে যেসব জিনিসের প্রতি প্রকৃতিগত ভালোবাসা রাখা হয়েছে তাহলো- নারী এবং সুগন্ধি। কিন্তু আমার নয়নের প্রশান্তি নামায অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইবাদতের মধ্যেই নিহিত। বর্তমান বিশ্ব নারীর অধিকারের বিষয়ে বুলি আওড়ায় আর কয়েকটি ভাসা ভাসা কথাকে উত্থাপন করে, যার সাথে তাদের স্বাধীনতার কোন সম্পর্কই নেই। পক্ষান্তরে, ইসলাম নারীদের বিষয়ে যে বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে তা-ও নারী জাতির সম্মান প্রতিষ্ঠা করা এবং ঘরের শান্তি আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুশিক্ষার জন্য আরোপ করেছে। অথচ এগুলো নিয়ে ইসলামের উপর আপত্তিকারীরা আপত্তি করে থাকে। সত্যিকার অর্থে নারী স্বাধীনতা এবং তার অধিকার প্রদানের সত্যিকার শিক্ষা ইসলামই প্রদান করে। আল্লাহ্ করুন বিশ্ববাসী যেন এই সত্যকে অনুধাবন করে আর নোংরামি ও ফিৎনা-ফ্যাসাদ থেকে যেন দূরে থাকে, আর আমাদের নারীরাও যেন এই সত্যকে অনুধাবন করে। ইসলাম নারীদের যে মর্যাদা দিয়েছে তা যেন তারা অনুধাবন করতে পারে। কেননা এই অধিকার অন্য কোন ধর্মও দেয় নি আর নারী অধিকারের নামে নামসর্বস্ব তথাকথিত আলোকিত কোন সংগঠন এবং আন্দোলনও প্রদান করে নি। আল্লাহ্ তা'লা পুরুষদেরকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মহিলাদের প্রাপ্য প্রদানের তৌফিক দান করুন যেন একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ রচিত হয়।

এরপর সংক্ষিপ্তভাবে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমি দোয়ার আহ্বান করতে চাই, দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা করোনা মহামারিরূপী আপদের কবল থেকে জগদ্বাসীকে মুক্ত করেন, আর মানবজাতিকেও আল্লাহ্ তা'লা এই চেতনাবোধ দান করুন যে, তাদের অস্তিত্বের নিশ্চয়তা এবং মুক্তি খোদার সমীপে ঝুঁকা ও বিনত হওয়া এবং ত্যাগ স্বীকার করে পৃথিবী থেকে নৈরাজ্য দুরীভূত করার মাঝে নিহিত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন সরকারকে কাণ্ডজ্ঞান দান করুন যেন তারা ন্যায় নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করা শিখে। আমেরিকাতে আজকাল অশান্তি ও অস্বস্তি বিরাজমান। বিশেষভাবে প্রত্যেক আহমদীকে আল্লাহ্ তা'লা এর কুফল থেকে নিরাপদ রাখুন। আর সার্বিকভাবে সাধারণ জনগণকে নিজেদের দাবিদাওয়া সঠিকভাবে উপস্থাপন এবং অধিকার আদায়ের তৌফিক দিন। আফ্রো আমেরিকানরা

ভাঙচুরের মাধ্যমে যদি নিজেদের ঘর জ্বালায় তাহলে তাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে। কেননা অনেক আফ্রিকান নেতাও এ সম্পর্কে বলেছে যে, নিজেদের ঘর জ্বালাবে না, নিজেদের ঘর ভাঙচুর করবে না। তবে হ্যাঁ, নিজেদের প্রাপ্য অধিকার বৈধভাবে আদায় করতে পার। অর্থাৎ রাষ্ট্র যতটকু অধিকার দিয়েছে সে অনুযায়ী নিজেদের অধিকার আদায় কর। প্রতিবাদ কর, তবে নিজেদের সম্পত্তি ধ্বংস করে কোন লাভ নেই, বরং এতে নিজেদেরই ক্ষতি। তাই প্রতিবাদকারীদেরও এই বিষয়ে ভাবা উচিত। যাহোক, সরকারী ব্যবস্থাপনারও বিষয়টি অনুধাবন করতে হবে। এ সমস্ত নৈরাজ্য-বিশৃঙ্খলার প্রেক্ষাপটে তাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, কেবল বল প্রয়োগ করেই সমস্যা নিরসন করা যায় না, আর বল প্রয়োগ বা ক্ষমতা প্রদর্শন সমস্যার সমাধান নয়, বরং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে সব নাগরিকের অধিকার প্রদান করলেই সরকার সফল হতে পারে, রাষ্ট্রে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বহাল হতে পারে, এছাড়া নয়। সরকার যত ক্ষমতাধরই হোক না কেন, যদি নাগরিকদের মাঝে অস্থিরতা বিরাজ করে তবে তাদের বিরুদ্ধে গিয়ে কোন সরকারই টিকে থাকতে পারে না। যাহোক পৃথিবীর যে স্থানেই নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা আছে, তা দূরীভূত হোক এবং সরকার সাধারণ জনগণের অধিকার আদায় করবে এবং জনগণও নিজেদের বৈধ অধিকার আদায় করার জন্য বৈধ পদ্ধতিতে সরকারের ওপর চাপ পয়োগ করা শিখবে– আল্লাহ্‌র কাছে এটিই আমার দোয়া। তেমনিভাবে পাকিস্তান সরকারেরও ভাবা উচিত, কেবলমাত্র মোল্লার ভয়ে বর্তমানে সেখানে আহমদীদের উপর যে অত্যাচার ও নির্যাতন বাড়ছে তা করবেন না, বরং ন্যায়ের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করুন। নিজেদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। আহমদীয়াতের বিষয় নিয়ে বা এই ইস্যু নিয়ে এবং অত্যাচার করে পূর্বেও কোন সরকার টিকে নি আর ভবিষ্যতেও টিকবে না। তাই এই ধারণা পরিত্যাগ করুন যে, এই ইস্যু নিয়ে শাসনকাল দীর্ঘায়িত করতে পারবেন। হ্যাঁ, এ সমস্ত অত্যাচারের ফলে পৃথিবীতে আহমদীয়াতের উন্নতি পূর্বের চেয়ে বেশি হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এমনই হবে; ইনশাআল্লাহ্‌। এটি খোদা তা'লার কাজ আর এটিকে কেউ বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না।

যাহোক, আমারা দোয়া করি, আল্লাহ্‌ তা'লা প্রতিটি স্থানে অত্যাচার, নৈরাজ্য ও অশান্তি দূর করুন আর বর্তমানে যে মহামারি বা ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে– এ থেকে শিক্ষা নিয়ে মানুষ যেন নিজেদের মাঝে পরিবর্তন আনয়ন করে। আমাদের আহমদীদের যেন পূর্বের চেয়ে অধিক হারে খোদা তা'লার ইবাদত ও তাঁর বান্দাদের অধিকার আদায়ের তৌফিক লাভ হয়। আমরা যেন পূর্বাপেক্ষা বেশি খোদা তা'লার ভালোবাসা অর্জন করতে পারি এবং যথাশীঘ্র জামা'তের উন্নতি প্রত্যক্ষ করি।